দৈনিক খবর
তারিখ 09 MAR 1993 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার অধিকারে প্রধান শিক্ষকের বাধা

○কে এম সোবহান ○

মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলের বাবা–মা নাম রেখেছিলেন শুভ। ঐ নামই ডাকেন ছেলেটিকে তার বাবা–মা, তার সহপাঠী, বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়–স্বজন। পাড়াতেও পরিচিত ঐ নামেই। মেধাবী ছেলে। সামনের দিকে তাকানো ছেলে। পোশাকী নামও আছে–আশিকুর রউফ। স্কুলের খাতায় তার ঐ নামই লেখা আছে। মোহাম্মদপুরের সোনালী বুক ডিপোর মালিক শুভ'র আব্বা মোহাম্মদ আতাউর রহমান। শুভ'র মা ফরিদা বেগম একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষিকা। শুভ এতদিন পড়ছিল স্থানীয় কাকলী স্কুলে। সকল ছেলের অভিভাবকের মত তার আব্বা–মাও চেয়েছিলেন ছেলে বড় স্কুলে, সরকারী স্কুলে পড়বে। সেই ইচ্ছামত ঢাকার হাজার হাজার ছাত্রের মত শুভ ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিল মোহাম্মদপুর সরকারী বিদ্যালয়ে। মেধা তালিকায় সে তার ক্লাসে প্রথম হয়। স্বভাবতঃই শুভ নিজে এবং তার আব্বা–মা মনে করেছিলেন যে, ছেলে পড়তে যাবে বড় স্কুলে। শুভকে ভর্তি ফরম দেয়ার আগে তাকে শিক্ষকরা নিয়ে যান প্রধান শিক্ষকের কাছে। প্রধান শিক্ষক বাতিল করে দিলেন তাকে। শুভ'র অপরাধ পেলেন প্রধান শিক্ষক তার শারীরিক অপূর্ণতায়। তার সে রকম কোন অসুখ নেই যা থেকে সংক্রামিত হতে পারতো অন্য ছেলেরা। স্বাস্থ্যহানি হতে পারতো অন্য ছাত্রদের। স্কুলের সকল ছাত্রের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা বা স্কুলের ছাত্রদের সার্বিক কল্যাণের দিকে কড়া নজর রাখা স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব–এ কথা কেউই অস্বীকার করবেন না। শুভকে বাতিল করার কারণ হচ্ছে তার জন্মগত কিছু খুঁত। সে খুঁত সারানো হয়েছে চিকিৎসা করে। জন্মগতভাবে শুভ'র উপরের ঠোঁট কাটা ছিল– যাকে বলা হয় গন্নাকাটা। ইংরেজীতে বলে হেয়ার লিপ। এর চিকিৎসার জন্যে প্লাস্টিক সার্জারী করা হয় যাতে ঠোঁটের উপর শুধু একটি কাটা দাগ থাকে। তবে বলার সময় এদের কথার মধ্যে কিছুটা নাকের থেকে আওয়াজ বের হয়। তবে তাতে তাদের কথা বলার বা তাদের কথা বোঝার কোন অসুবিধা হয় না। যার এ ধরনের কাটা থাকে তার আয়তাধীন নয় এর প্রতিক্রিয়া।

একটি সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক কেবল এ কারণেই তাকে বাতিল ঘোষণা করলেন। তাকে ভর্তি না করার কারণ হিসেবে যা বললেন তা অভিনব। তিনি বললেনঃ শুভ'র সহপাঠীরা তাকে উপহাস করতো এবং শিক্ষকরা এর জন্যে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তেন। প্রধান শিক্ষকের এ যুক্তি একেবারেই খোঁড়া। তার কারণ, শুভ বর্তমানে একটি স্কুলে পড়ছে। মোহাম্মদপুর সরকারী স্কুলে যে ক্লাসে সে পড়ার জন্যে এসেছিল (চতুর্থ শ্রেণী) সেখানকার ছাত্ররা কয়েক দিনের মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে পড়তো তার বাচনভঙ্গিতে। কোমলমতি ছেলেরা যদি শুভকে উপহাস করতো তাহলে শিক্ষকদের সে বিষয়ে কি কর্তব্য তা নিশ্চয়ই বলে দেবার প্রয়োজন করে না। ছেলেদের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ রাখাই শিক্ষকদের অন্যতম কর্তব্য। অন্য যে সব ছেলে শুভকে উপহাস করতো তাদের নিশ্চয়ই বোঝান যেত এবং পরিবেশ স্বাভাবিক করা যেত। কিন্তু প্রধান শিক্ষক তার নিজের এবং শিক্ষকদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন শুভকে ভর্তি না করে। শুভ ফিরে যাবে তার পুরাতন স্কুলে। সেখানেই সে পড়বে। তার বড় বোনও মেধাবী ছাত্রী। সে বৃত্তি পেয়েছে। শুভও বলেছে যে, সে বৃত্তি পরীক্ষা দেবে এবং বৃত্তি পাবে বলে সে বিশ্বাস করে। প্রধান শিক্ষকের এই অমানবিক আচরণের পরও সে যে আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছে তার জন্যে তাকে অভিনন্দন জানানো উচিত।

শুভ'র ভর্তির বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি তদন্ত করতে যেয়ে তার আব্বার সঙ্গে কথা বলেন এবং শুভ'র সঙ্গেও কথা বলেন। প্রতিনিধি মত প্রকাশ করেন যে, শুভ'র বাচনভঙ্গিতে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও সে কি বলছে তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। সে ক্লাসে কোন প্রশ্নের উত্তর দিলে প্রশ্নকারীর তার উত্তর বুঝতে কোন কষ্টই হতো না। শুভ'র আব্বা কিছুটা আশাহত হলেও শুভ'র মধ্যে ভর্তি হতে না পারার জন্যে কোন অভিযোগ নেই। সে বলেছে যে, সে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাবে আগের মতই। সে আশা করেছিল একটি বড় স্কুলে পড়বে এবং সে মনে করেছিল যে, তাতে তার ভবিষ্যৎ ছাত্রজীবন আরও উজ্জ্বল হবে। শুভ'র আব্বা চাননি বিষয়টি আলোচনার বিষয়বস্তু হোক। তবে তিনি মনে করেন যে, প্রধান শিক্ষকের এই ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়। প্রধান শিক্ষক তার স্কুলের প্রধান এবং তার দায়িত্বও অনেক, ক্ষমতাও অনেক। এ ক্ষেত্রে তিনি যে কেবল অশিক্ষকসুলভ আচরণ করেননি তাই নয়– তিনি ক্ষমতারও অপব্যবহার করেছেন। সরকার যখন শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করছে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলছে তখন ঐ প্রধান শিক্ষক বালখিল্যতার পরিচয় দিয়ে সরকারী প্রচেষ্টার বাধা সৃষ্টি করেছেন। তিনি কেবল সরকারী প্রচেষ্টাতেই বাধা দিচ্ছেন তাই নয়– তিনি সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা লংঘন করেছেন। বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ "রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক–বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্যে (খ) সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করবার জন্যে এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্যে (গ) · · · কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।" এই মূলনীতিকে কার্যকর করার জন্যে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মোহাম্মদপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যে কারণে শুভকে স্কুলে ভর্তি হতে দেননি সেটি সরকারের ব্যবস্থার সঙ্গে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ, তার বিচার সরকারকে করতে হবে। সরকারী স্কুলেই সরকারের ব্যবস্থা কার্যকর করতে বাধা পাচ্ছে একজন প্রধান শিক্ষকের খামখেয়ালীর জন্যে।

মানবাধিকার কমিশনের ঘটনা তদন্তকারী প্রতিনিধি আরও জানতে পারেন যে, ঐ প্রধান শিক্ষক আরও একটি ছেলেকে ভর্তি ফরম দেননি। সেই ছেলেটির নাম রোজার জন্যে স্কুল বন্ধ থাকায় জানা যায়নি। সেই ছেলেটিও ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। ঐ ছেলেটির পোলিও হওয়ায় তার একটি পায়ে ত্রুটি থাকার কারণে সে খুঁড়িয়ে হাঁটে। শারীরিক খুঁত থাকার কারণে ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রদের একটি সরকারী স্কুলে ভর্তি করা হবে না– এই নির্দেশ কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের? যদি এ ধরনের কোন নির্দেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের না থাকে এবং থাকতে পারেও না তাহলে প্রধান শিক্ষক কেবলমাত্র নিখুঁত শরীরযুক্ত ছাত্রদের ভর্তি করার নিয়ম কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন? স্কুলে পড়াশোনা করার স্থান। সেখানে মেধার প্রতিযোগিতার সঙ্গে সুঠাম দেহের প্রতিযোগিতার পর ছাত্রদের ভর্তি করা হবে– এটা সরকারের নীতি হতে পারে না। নাৎসী জার্মানীতে এক সময় হিটলার খাঁটি আর্য জাতি সৃষ্টির জন্যে তাদের উচ্চতা হবে ৬ ফুটের উপর, চোখের রং হবে নীল, মাথার চুল সোনালী, বাঁশীর মত নাক ইত্যাদির জন্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। সেই বিকৃত মানসিকতায় মোহাম্মদপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্রান্ত হয়েছেন।

শিশু অধিকার রক্ষার সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষর দানকারী রাষ্ট্র। সেই শিশু শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে একজন ক্ষমতার অপপ্রয়োগকারী প্রধান শিক্ষকের কারণে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ "(ক) প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্যে সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। (খ) ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও মানবিক অধিকার এবং মৌলিক অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও সকল জাতি, বর্ণ এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব উন্নয়ন ও শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে। (গ) যে প্রকার শিক্ষা তাদের সন্তানদের দেয়া হবে তা পূর্ব থেকে বেছে নেয়ার অধিকার পিতামাতার রয়েছে।"

শিশু অধিকার রক্ষা ঘোষণায় বলা হয়েছে, শিশুর শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে যা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হবে অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত। তাকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে সমাজের একজন প্রয়োজনীয় সদস্য হিসেবে বড় হতে পারে। জাতিসংঘ ১৯৭৯ সালকে 'শিশু বর্ষ' হিসেবে পালন করার নির্দেশ দেয়। ১৪ বছর পর সরকারী স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক তাঁর স্কুলে হিটলারের নিয়ম চালু করে শারীরিক খুঁতযুক্ত অথচ মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করছেন। স্কুলটি যদি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিও হতো তাহলেও তিনি ঐ ধরনের বিকৃত নিয়ম চালু করতে পারতেন না। সরকারী স্কুলে বেতন কম, সেখানে সুযোগ–সুবিধা বেশী– সেই কারণে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। সেখানে ভর্তি হওয়ার অধিকার ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যেকটি ছাত্রেরই আছে।

বাংলাদেশে শিক্ষার হার দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম। শ্রীলংকার মত ছোট্ট একটি দেশে যার অর্থনীতি বাংলাদেশের মতই পঙ্গু সেখানেও শতকরা ৭০ জন শিক্ষিত। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা খাতে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করছে দেশের শিক্ষা প্রসারের জন্যে। কিন্তু যদি এ ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন প্রধান শিক্ষক স্কুলের দায়িত্বে থাকেন তাহলে শিক্ষা প্রসার বাধাগ্রস্ত হবেই। শুভ'র এবং পোলিও আক্রান্ত সেই নাম না জানা ছেলেটি "প্রকৃতির খেয়াল" নয়। পৃথিবীতে লাখ লাখ ছেলেমেয়ের ঐ ধরনের খুঁত থাকে। কিন্তু সে কারণে তাদের স্কুলে ভর্তি করা হবে না– এটা বোধহয় মোহাম্মদপুর সরকারী বিদ্যালয়েই প্রথম চালু করা হলো সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে।

মোহাম্মদপুর সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম দেয়া হয়েছে ২৩–২–৯৩ তারিখে। কাজেই ভর্তি হওয়ার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় একদিকে সর্বস্তরে শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে, অথচ অন্যদিকে রাজধানীতে সরকারেরই একটি স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক শারীরিকভাবে নিখুঁত ছাত্রের প্রতিযোগিতায় ছাত্র ভর্তি করার নীতি প্রথা করেছেন। সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে এ ধরনের রীতি কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ তার বিচারের ভারও শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরই। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে। কাজেই বিষয়টি যে সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়নি– এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। যদি দৃষ্টিগোচর হয়েই থাকে এবং এর প্রতিকার করা না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে, এটাই সরকারের নীতি যা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয় এবং সভ্য জগতে তা নিন্দনীয় হবে।